দৈনিক সংবাদ

তারিখ 01 DEC 1993 পৃষ্ঠা 8 কলাম ৩

উন্নয়নে শিক্ষার অবদান

ডঃ আতিউর রহমান

জাতি হিসেবে আমরা কেমনটি হতে চাই, কোথায় যেতে চাই, কি শিখতে চাই—এসব বিষয় পরস্পর নির্ভরশীল। রবীন্দ্রনাথ আরো স্পষ্ট করে এ সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কী হইব এবং আমরা কী শিখিব, এই দুটা কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যত বড় জল তাহার চেয়ে বেশি ধরে না।" (রবীন্দ্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড পৃঃ ৬৯১)।

শিক্ষা ছাড়া যে উন্নয়ন হয় না তার প্রমাণ, পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ নেই যার প্রতিটি মানুষ সুশিক্ষিত ও দক্ষ কিন্তু দেশটি উন্নত নয়। উন্নয়নের জন্যে শিক্ষা কতোটা অপরিহার্য তা বুঝতে হলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর বিস্ময়কর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাফল্যের দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ার শ্রীলঙ্কার সাফল্যও লক্ষ্য করার মতো। দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া আশির দশকে গড়ে ৭ থেকে ৯ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এ দেশগুলোর মাথাপিছু আয় বেড়েছে, শিশুমৃত্যুর হার কমেছে, জীবনের গড় আয়ু বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। এসব দেশে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে চমৎকার উন্নয়নের পেছনে সর্বজনীন শিক্ষা অর্জনের অভিপ্রায় ও সাফল্য বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে। ষাটের দশকের শুরুতে ইন্দোনেশিয়ায় সাক্ষরতার হার ছিল ৩৯%। ১৯৮৫ সালে এ হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২ শতাংশে। দক্ষিণ কোরিয়া ও থাইল্যান্ডের সাক্ষরতার হার আগে থেকেই ভালো ছিলো (৫০%-এর ওপর)। উল্লিখিত সময়ে এ দুটো দেশ আগের সাফল্যকে সংহত করে আরো দ্রুত বাড়তি সাফল্য অর্জন করেছে। ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ কোরিয়া প্রায় সবাইকে সাক্ষর করে ফেলেছে। থাইল্যান্ডের ক্ষেত্রে এ হার ৯১ শতাংশ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের বেলাতেও 'সকলের জন্যে শিক্ষা' অভিমুখে যাত্রা প্রায় একই রকমের। ভিয়েতনাম ও চীন প্রথম থেকেই সকল নাগরিকের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার বেলায় মোটেও গড়িমসি করেনি। সমাজতন্ত্রের অবদান হিসেবে এ দুটো দেশের শিক্ষা সাফল্য উল্লেখ করার মতো। তাছাড়া এ অঞ্চলের প্রতিটি দেশেই মেয়েদের শিক্ষার বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। যারা প্রাথমিক পর্যায়ে স্কুলে এসেছে তারা যাতে অচিরেই ঝরে না পড়ে সেদিকেও নজর রাখা হয়েছে। কোনো কোনো দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে ওঠার জন্য কড়াকড়ি শিথিল করা হয়েছিল। ফলে ঝরে পড়ার হার তেমন আশংকাজনক হতে পারেনি। অবিশ্যি রাষ্ট্র প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বরাবরই বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় সাফল্য অর্জনের পর মাধ্যমিক শিক্ষাকে প্রযুক্তিভিত্তিক ও কর্মভিত্তিক করার কাজে তারা হাত দিয়েছে। কোনো কোনো দেশ (যেমন দঃ কোরিয়া) এ শতাব্দীতেই সকলের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক করার কথা ভাবছে। এ দুটো পর্যায়ে শিক্ষার শক্ত ভিত্তি গড়ার পরেই কেবল উচ্চ শিক্ষার দিকে নজর দেয়া হচ্ছে। তবে রাষ্ট্র সকল পর্যায়ের শিক্ষার জন্যই অবকাঠামো গড়তে মোটেই কার্পণ্য করেনি। কিন্তু যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হচ্ছে উচ্চ শিক্ষাখাতে রাষ্ট্রের চেয়ে ব্যক্তিখাতের ভূমিকা অধিকতর। দক্ষিণ কোরিয়া তার শিক্ষা বাজেটের মাত্র দশ শতাংশ উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যয় করে। সিঙ্গাপুর করে ৩০ শতাংশ।

প্রতিটি দেশই তার মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ থেকে ৯ শতাংশের মতো ব্যয় করে শিক্ষাখাতে। যার সিংহভাগই যায় প্রাথমিক শিক্ষাখাতে। প্রাথমিক শিক্ষা সংহত হয়ে গেলে মাধ্যমিক শিক্ষা গুরুত্ব পেতে থাকে। রাষ্ট্র দক্ষ জনশক্তি গড়ার জন্য নীতি সহায়তা ছাড়াও আনৃতাপ্রেনিওর'দের চাহিদামতো প্রশিক্ষণ, শিক্ষার ধারা ও মান নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী ও শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের মধ্যে একটি কোয়ালিশন গড়ার কাজেও বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে আসছে। শিক্ষার মূল্য জনমনে প্রোথিত করার কাজেও রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার অর্থনৈতিক অবদানের দিকে খেয়াল রেখে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রেও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় রাষ্ট্রসমূহ সংবেদনশীল ভূমিকা রেখেছে। আর সেজন্য মৌলিক শিক্ষাখাতে ইন্দোনেশিয়া শিক্ষা বাজেটের ৮৯%, দক্ষিণ কোরিয়া ৮৪% ব্যয় করছে।

আগেই উল্লেখ করেছি শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধারার ব্যয় বরাদ্দ এবং নীতি সমর্থনের কারণে উন্নয়নের মূল লক্ষ্য 'উন্নত জীবনমানে'র ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। শিক্ষা দরিদ্র শ্রেণীর ক্ষমতায়ন ছাড়াও তাদের গড় আয়ু বাড়িয়েছে, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করেছে।

শিক্ষা যে উন্নয়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে তা বেশ স্পষ্টভাবেই বের হয়ে আসে। মোটা দাগে বলা চলে তিনটি ক্ষেত্রে এ দুয়ের সম্পর্ক খুবই স্পষ্ট ঃ

ক) শিক্ষা জনশক্তির মান বাড়ায়। এর ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়ে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়ে।

খ) সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা আর্থ-সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করে। মানুষের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে মৌলিক শিক্ষা উন্নয়নের চূড়ান্ত লক্ষ্য উন্নত জীবনের মান নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। নিম্ন শিশু মৃত্যুর হার, উচ্চ জীবনের আয়ু এবং সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য—এসব লক্ষ্য অর্জনে প্রাথমিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করা হয়।

গ) শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে সাহায্য করে। শিক্ষা যে মানুষের জীবন উন্নত করতে খুবই প্রয়োজনীয় এ কথাটি মানুষের মনে গেঁথে দিতে পারলে সমাজ ও অর্থনীতিতে সচলতা আসে।

উন্নয়নের জন্য শিক্ষার এমন বহুমুখী অবদানের বিষয়টি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা দেশে এবং দক্ষিণ এশিয়ার কোনো কোনো দেশে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায়নি। বলা যায় এক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রচেষ্টা ও অভিজ্ঞতা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্যর্থতা পাহাড় সমান।

ক) স্বাধীনতা লাভের ২২ বছর পরেও বাংলাদেশের সার্বিক সাক্ষরতার হার শতকরা ২৫ ভাগের আশপাশেই ঘুরপাক খাচ্ছে। বয়স্ক সাক্ষরতার হার (১৫ বছরের উর্ধ্বের মানুষদের জন্য প্রযোজ্য) শতকরা ৩২ ভাগে গত প্রায় একদশক থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

খ) বাংলাদেশের প্রাথমিক স্কুলে যাবার মতো বয়েসী শিশুদের শতকরা ৪০ ভাগ শিশু স্কুলেই যায় না। যারা যায় তাদের ৩১% দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওঠার আগেই ঝরে পড়ে। পঞ্চম শ্রেণীতে উঠতে উঠতে এদের ৭০% ঝরে পড়ে।

গ) মাধ্যমিক পর্যায়ে যে শিক্ষা আমরা দেই তার সাথে কর্মসংযোগ নেই বললেই চলে। কৃষিখাতে উচ্চফলনশীল ফসল উৎপাদন কিংবা শিল্পখাতে দক্ষ শ্রমশক্তি সরবরাহ উভয় ক্ষেত্রেই মাধ্যমিক শিক্ষার কোনো ভূমিকাই নেই। পেশাগত সচলতা বাড়ানোর মতো সীমিত উপকারিতা ছাড়া উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ শিক্ষার ভূমিকা গৌণ।

ঘ) উচ্চশিক্ষার অবস্থা আরো খারাপ। সাধারণ বিষয়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত স্নাতকেরা চলমান সময়ের চাহিদা মেটাতে প্রায় পুরোপুরিই ব্যর্থ। শিল্প ও ব্যবসা খাতের ২৫৮ জন উত্তরদাতার ওপর পরিচালিত হালের এক জরিপ থেকে জানা যায় যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে ধরনের শিক্ষা দেয় তা মোটেই কাজে লাগে না। উত্তরদাতাদের শতকরা ৯০ ভাগই এ রকম মত প্রকাশ করেছেন।

ঙ) আমাদের প্রযুক্তি বিষয়ক উচ্চ শিক্ষার মান অবিশ্যি খুব খারাপ নয়। সামান্য উদ্যোগ নিলেই এ খাতের শিক্ষাকে আরো প্রাসঙ্গিক করা সম্ভব।

চ) শিক্ষাখাতের এখনও সিংহভাগ খরচা হয় উচ্চশিক্ষা খাতে। শিক্ষা বাজেটের ৪৩% খরচা হয় উচ্চশিক্ষার জন্য। অথচ উচ্চশিক্ষিতের একজনও নিচের দিকের শতকরা ৫০ ভাগ মানুষের ছেলেমেয়েদের মধ্য থেকে আসে না। প্রাথমিক শিক্ষাখাতের জন্য যতটুকুন বরাদ্দ করা হয় তারও পুরোটা খরচা হয় না। অথচ উচ্চশিক্ষাখাতে এডিপিতে যে বরাদ্দ দেয়া থাকে বাস্তবে তারচে অনেক বেশি খরচা হয়।

ছ) দক্ষিণ কোরিয়ায় যেখানে প্রতিটি প্রাথমিক ছাত্র/ছাত্রীর জন্য বছরে খরচ হয় ৩৯০ ডলার বাংলাদেশে তার পরিমাণ মাত্র সাড়ে বারো ডলার। বাংলাদেশে একজন প্রাথমিক ছাত্র/ছাত্রীর জন্যে সরকার যা খরচ করে তা উচ্চশিক্ষা পর্যায়ের একজন ছাত্র/ছাত্রী বাবদ সরকারী খরচার মাত্র ২%।

জ) বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় যে দুর্যোগ ঘটে গেছে তার প্রমাণস্বরূপ দুটো বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারেঃ এক, এই মুহূর্তে আমাদের দেশের প্রায় এক লাখ ছাত্র/ছাত্রী পার্শ্ববর্তী দেশে লেখাপড়া করছে এবং আরো কয়েক হাজার পশ্চিমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ছে। দুই, প্রতিদিনের পত্রপত্রিকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সহিংসতা, সেশন জট ও বিশৃঙ্খলার খবর ছাপা হচ্ছে।

চ) বাংলাদেশের উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, 'ইনফর্মাল শিক্ষা' ও প্রশিক্ষণের ঐতিহ্য নেই বললেই চলে। অথচ এর আগে উল্লেখিত এক জরিপ থেকে জানা যায় শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ এখন এসব ক্ষেত্রে পয়সা খরচা করতে আগ্রহী। বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা করার অভিপ্রায় থেকেই তারা এখন প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ করতে চান। কিন্তু আমাদের নীতি নির্ধারণী পরিবেশ ও চলমান শিক্ষাব্যবস্থা এ চাহিদা মোকাবেলা করার জন্য যথেষ্ট নয়।

উপরে বর্ণিত শিক্ষা সমস্যা ও বাস্তবতা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এ যুগের উন্নয়ন চাহিদা মেটাতে পারছে না। অথচ আমাদের নীতি নির্ধারকরা এ বিষয়টিকে তেমন গুরুত্বই দিতে চাইছেন না। স্বাধীনতার উষালগ্নেই আমরা পেয়েছিলাম একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান। সে সংবিধান শিক্ষাকে মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সেই স্বীকৃতির আলোকে ১৯৭৪ সালে ডঃ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি উন্নতমানের শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট তৈরি হয়েছিল। ঐ কমিশন সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা এবং শিক্ষাকে 'সম্পদ সৃষ্টি'র হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করার জন্য জোর তাগিদ দিয়েছিল।

এতোগুলো বছর কেটে গেলেও আমাদের নীতিনির্ধারকরা জাতির বাঁচার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ শিক্ষাকে রক্ষা ও সমৃদ্ধ করার তেমন কোনো উদ্যোগ নিচ্ছেন না। হতে পারে তাদের সন্তানদের শিক্ষা বিদেশের মাটিতে নিরাপদ বলেই তারা এমন উদাসীন থাকতে পারছেন। কিন্তু সিভিল সমাজের অন্যান্য পেশাজীবী, সংগঠক ও উদ্যোক্তারা এমন নির্লিপ্ত কেন এ প্রশ্নে। এটি এমনি এক বিষয় যা আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ, আইন প্রণয়নকারী সংস্থা কিংবা বক্তৃতাদানকারী গোষ্ঠীর হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। পুরো সমাজকে শিক্ষাব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ও উচ্চ মান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষাখাতে পুনর্গঠন আনতে না পারলে, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি' কিংবা অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও খুব বেশিদূর অগ্রগতি করতে পারবো বলে মনে হয় না। আর যদি শিক্ষাখাতে শুভ পরিবর্তন আনতে পারি তাহলে সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি সর্বত্রই ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

তার মানে এই নয় যে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় রাজনৈতিক সামাজিক মডেলের হুবহু প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষাখাতে কাঙ্ক্ষিত সেই পরিবর্তন আনতে হবে। শুধু বলছি আমাদের বহুমতাবলম্বী, সহনশীল, গণতান্ত্রিক সমাজের মূল চরিত্র ঠিক রেখেও আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শিক্ষা অভিজ্ঞতা থেকে মূল্যবান শিক্ষা নিতে পারি। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সবাইকে সাক্ষরতা প্রদান, প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়া, মাধ্যমিক শিক্ষাখাতকে প্রযুক্তি নির্ভর করা, উচ্চ শিক্ষাখাতকে যুগোপযোগী করা, সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে শিক্ষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা—এ সব শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সহজেই আমাদের দেশেও প্রাসঙ্গিক। অন্যকে দোষ না দিয়ে, নিজেদের চেহারাটা আয়নায় দেখে আমরা কি নিজেদেরকেই প্রশ্ন করতে পারি না—শিক্ষাখাতের এ বিপর্যয় মোকাবেলায় আমরা ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগতভাবে কে কী করেছি।

সবাই এমন আত্মসমালোচনা ও সম্মিলিত উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টা নিলে নিশ্চয় এ-দুর্যোগ কেটে যাবে। দুর্যোগে বাঙালি চমৎকার সৃজনশীলতা ও সাহসী ভূমিকা রেখেছে। তাহলে শিক্ষা বিপর্যয়ে কেন আমরা সাহস করে তার মোকাবেলা করতে পারবো না। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন একটা জাতির পক্ষে আশাই মস্ত বড় সম্পদ। আশা করার অধিকার ও ক্ষমতা হারালেই জাতি বিপাকে পড়ে। তার ভাষায় ঃ "আমাদের জীবনে সুস্পষ্টতা নাই। আমরা যে কী হইতে পারি, কতদূর আশা করিতে পারি, তাহা বেশ মোটা লাইনে বড় রেখায় দেশের কোথাও আঁকা নাই। আশা করিবার অধিকারই মানুষের শক্তিকে প্রবল করিয়া তোলে।" (রবীন্দ্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃঃ ৬৯৯)। বাংলাদেশের এই সংকটকালে শিক্ষা বিপর্যয়কে মোকাবেলার জন্য জাতিকে অবশ্যই আশাবাদী হতে হবে।

[২৪ নভেম্বর, '৯৩, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ আয়োজিত জাতীয় অধ্যাপক আতোয়ার হোসেন স্মারক বক্তৃতা থেকে সংক্ষেপিত]